ঔপনিবেশিক জঙ্গল মহলের মাহালি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা

মৃন্ময় সরকার [1*]

[1*] বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, বরাবাজার বিক্রম টুডু মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত সরকারিভাবে "জঙ্গল-মহল" বলে কোন পৃথক শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ছিল না। পুরুলিয়া (বর্তমান সময়ে), বর্ধমান, মেদিনীপুরের বিভিন্ন অংশ পরিচিত ছিল "জঙ্গল-মহল" নামে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অরণ্য প্রধান এলাকাগুলিকে নিয়ে "জঙ্গল-মহল" নামে একটি জেলা তৈরী করা হয়, যার অন্তর্ভূক্ত ছিল-

ক) বীরভূম জেলার পাঁচেৎ, বাঘমুন্ডি, বোগান, কাডেন, তারফা বাহাপুর, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, কিসমত ছায়োতলি, তোরাঙ্গ, তাঙ্গ, নগর কিয়াসি,পাতকুম।

খ) বর্ধমান জেলার সেনপাহাড়ী, শেরগড়, কোতুলপুর, বালসি পরগনা ছাড়া বিষ্ণুপুর।

গ) মেদিনীপুর থেকে ছাতনা, বীরভূম, মানভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভালাইডিহা, আলাদা করে জঙ্গল মহলের সাথে যুক্ত হয়।[১]

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গল মহলের গঠন স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। বরং বহিরাগতদের শোষণে তাদের মনে তীব্র অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্ম দেয়। এই ব্যাপক অসন্তোষের ফল হল ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩২)। ভূমিজ বিদ্রোহের পর শাসনতান্ত্রিক একক হিসাবে জঙ্গল মহলের অবলুপ্তি ঘটানো হয়।[২] ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গল মহলেকে ভেঙে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি গঠন করা হয়। এই নতুন এজেন্সির প্রচেস্টা জঙ্গল মহলের বিভাজন। সেনপাহাড়ী, শেরগড়, বিষ্ণুপুর বর্ধমানের সাথে যুক্ত করা হয়। বাকি ধলভূমের এস্টেটগুলি মেদিনীপুর থেকে আলাদা রেখে মানভূম গঠন করা হয় (১৮৩৩)।[৩] ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের পর জঙ্গল মহল বলে পৃথক কোন শাসনতান্ত্রিক একক না বোঝালেও সাধারণ মানুষের কাছে এই এলাকা জঙ্গল মহল হিসাবে পরিচিত থেকে যায়।

জঙ্গল মহলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় যথা, মাহালি, সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধা, খেড়িয়া, কোড়া। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই জঙ্গল মহলের আদিবাসীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাহালি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

মাহালি

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক সীমা সংস্থানের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলাতেই সমধিক পরিমাণে মাহালি জনগোষ্ঠী বাসবাস। স্যার এইচ. এইচ. রিজলে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, মহিলারা সাঁওতালদেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা। তারা কিভাবে সাঁওতালদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা জানা যায় না। একটি প্রচলিত লোকশ্রুতি থাকে জানা যায় যে, তারা ঝুড়ি ও বাঁশের জিনিসপত্র তৈরী করত বলে সাঁওতাল সমাজ থেকে আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে পরে। রিজলে সাহেব তাদের পাঁচভাগে ভাগ করেছেন যথা, ১) বাশঁফোড় মাহালি, ২) পাতর মাহালি, ৩) সুলুংকি মাহালি, ৪) তাঁতি মাহালি, ৫) মাহালি মুন্ডা। বাঁশফোড়া মাহালিরা ঝুড়ি ও বাঁশের নানা রকম জিনিশ তৈরী করত; পাতর মাহালিরা বাঁশের কাজ ছাড়াও চাষবাস করত; সুলুংকি মাহালিরা চাষবাস ও ক্ষেত মজুরেরে কাজ করত; তাঁতি মাহালিরা পালকি বইত।[৪]

সাঁওতালদের মতো মাহালিদেরও নানা গোত্র আছে, যেমন হেমব্রম, হাঁসদা,কিসকু, বেসরা, টুডু, মান্ডি, বাস্কে, সরেন, গুদলি, ডুংরী ইত্যাদি। গোত্রগুলির সামাজিক রীতি বা প্রথা পালনে কিছু তারতম্য বা বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন কেউ সুপারি খায় না, , কেউ সিঁদুর ব্যবহার করে না, কেউ কেউ শাঁখা পড়াকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। আবার কারো হলুদ রাঙা কাপড় চলে না। গ্রাম পরিচালনার নিয়ম ও সংগঠন সাঁওতাদেরই অনুরূপ। এমনকি পোষাক পরিচ্ছদও সাঁওতালদের মতই। মেয়েরা পরিধান করে উলকি অ ছেলেরা পরিধান করে 'শিখী'। ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাহালিদের জনসংখ্যা ৫০,২৮৮ এবং তার মধ্যে পুরুষ ২৫,৪৭৪ ও স্ত্রীলোক ২৪,৮১৪। অবশ্য এর সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার মাহালিদের ধরা তার মধ্যে পুরুষ ৫৫২৫ ও মহিলা ৫৩০২।

অর্থনৈতিক অবস্থা-

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজ আমলে মাহালিদের আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও খাওয়া পড়ার কষ্ট ছিল না। দুবেলা অন্তত খাওয়া জুটত। কারণ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা প্রচুর কাজকর্ম পেত, বসে থাকতে হত না। এছাড়া গ্রামের হাটে বাজারে বাঁশের ঝুড়ি, ডালা, কুলো, পাখা, দর্মা ইত্যাদি বিক্রি করে রোজগার হত। গ্রামে তারা বাড়িতে সে সব বাঁশের জিনিশ ব্যবহার করত। বাঁশের অভাব তাদের এলাকায় ছিল না, অল্প দামেই তা পাওয়া যেত। বাঁশের এসব জিনিসপাতি বিক্রি করে তাদের ভালই লাভ হত। তা ছাড়া বনে জঙ্গলে আটেন নামে এক প্রকার লতা পাওয়া যেত, জঙ্গল থেকে এসব লতা তারা তুলে এনে ঝুড়ি তৈরি করে তারা হাটে বিক্রি করত। এসব কাজে মাহালি মেয়েরাও বসে থাকত না, তারাও ছেলেদের সাথে কাজ করত। ছোটবেলা থেকেই মাহালি ছেলে-মেয়েরা বাড়ির বড়দের সাথে কাজে হাত লাগাত, ফলে তাদের পড়াশনায় বিশেষ ঝোক ছিল না। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা ছিল পিছিয়ে। কৃষিকাজের দিকে তাদের ঝোঁক ছিল। কোম্পানীর থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তারা জমিতে চাষাবাদ শুরু করে ছিল এবং আস্তে আস্তে কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ সালের ''The Scheduled Caste and Scheduled Tribes order act''অনুযায়ী মাহালিদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু মাহালি সমাজকে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করার যে উদ্দেশ্য তা কতখানি সফল হয়েছে? ১৯৭১ সালে আদমসুমারীতে দেখা যায় ৯০.৪৯ শতাংশ মাহালি নিরক্ষর। আবার দেখা যায় মাহালিদের অনেকেই তাদের পূর্বের পেশা হারাতে বাধ্য হয়েছে। পূর্বে তারা বাঁশের ঝুড়ি, পাখা, মাছ ধরার ঘুনি ইত্যাদি তৈরি করত কিন্ত প্লাস্টিক শিল্পের প্রসারের ফলে তাদের কুটীর শিল্প দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুত পরাধীন ভারতের থেকে স্বাধীন ভারতে মাহালিদের অবস্থার খুব একটা বেশি উন্নতি হয়নি।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

মাহালি ভাষা মুন্ডারী ভাষার মধ্যে পড়ে। তবে ক্রমশ তারা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে পড়ায় তাদের কথাবার্তার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকেই আর নিজস্ব ভাষায় কথা বলে না। মানভূম বা পুরুলিয়ার ভাষায় কথা বলে। এটাকে অনেকেই 'মানভূমি বাংলা' বলে থাকে।[৫]

মাহালিরা জঙ্গলমহলের যে সমস্ত গ্রামে বসবাস করে সেই সমস্ত গ্রামে তাদের নিজেস্ব সংগঠন বা পঞ্চায়েত আছে। ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে মাহালিরা নিজেদের সামাজিক সম্যসাগুলির সমাধান করে এই সকল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এরাই মাহালি গ্রামের সমস্ত রকম বিরোধ বিবাদের মীমাংসা করেন। মাহালিরা সবসময় সাঁওতালদের বড়ভাইয়ের মত ভাবে এবং সমস্যা সমাধানে সাঁওতাল-প্রধান মাঁঝিদের সাহায্য নেয়।

অন্যান্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মত মাহালি সমাজেও বাড়ির ছলেরা পিতার সম্পত্তির আধিকার পায়। মেয়েরা কেবল ভরণ-পোষণ পায়। মাহালি সমাজে ছেলে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হলে বিবাহ দেওয়া হয়। সমাজে বাল্যবিবাহ দেখা যায় না। তবে একেবারেই যে দেখা যায়না। সগোত্র ও জ্ঞাতি বিবাহ মাহালি সমাজে নেই। তবে বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে অনায়াসে দেবর বিবাহ কোঁড়তে পারে, কিন্তু ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে ভাসুর কিছুতেই বিবাহ

করতে পারে না। সাধারণত বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহের প্রস্তাব আসে ছেলের পক্ষ থেকেই। কণ্যাপণ প্রচলিত আছে। কনে পছন্দ হলে পাত্র পক্ষের কর্তা ব্যক্তিরা মালা অথবা শাড়ি দিয়ে কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। তারপর নির্দিষ্টকরণ করা হয় বিবাহের দিনক্ষণ। বিবাহের পূর্বে বর বিয়ে করে আমগাছকে এবং বধূ বিবাহ করে মহূয়া গাছকে।[৬]

অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মতই মাহালিদের বিবাহে কণ্যাপণ লাগে। পণের সঙ্গে একটি শাড়ি কনের জন্য আর একটি শাড়ি কনের মায়ের জন্য। মাহালি সমাজে সম্বন্ধ করে বিয়ে বেশি হলেও প্রণয়ঘটিত বিবাহও দেখা যায়। ছেলে অনেক সময় একরকম জোড় করেই মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। কণেপক্ষের অজান্তেই এরূপ ঘটনা ঘটলে গ্রামের মোড়লের কাছে অভিযোগ করা হয়। মোড়ল তখন পঞ্চায়েত ডাকেন। এক্ষেত্রে ছেলের কাছ থেকে পণ টাকা আদায় করে কণেপক্ষকে দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রাম প্রধানকে বিষয়টা জানাতে হয়। গ্রাম প্রধান পঞ্চায়েত ডাকেন। মাহালি সমাজে নায়কে, পারানিক, গড়েক, সবাই পঞ্চায়েত সভায় উপস্থিত থাকেন। মেয়ের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ চাইলে পণের টাকা ফেরত দিতে হয়। কিন্তু ছেলে পক্ষ যদি বিচ্ছেদ দাবী করে তাহলে পণের টাকা ফেরত দেওয়া হয় না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী পুনরায় বিবাহ কোঁড়তে পাড়ে। এই বিবাহকে 'সাঙ্গা' বলা হয়।[৭]

মাহালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পঞ্চম দিনে নখ, চুল কেটে স্নানের মাধ্যমে অশৌচ অবস্থার সমাপ্তি ঘটানো হয় এবং পাড়া প্রতিবেশীদের 'নিম দঃমডি' এবং হাড়িয়া খাওয়ানো হয়। এই অনুষ্ঠান্টিকে 'ছীটিয়ীর' অনুষ্ঠান বলে। এই সময় নবজাতকেরও নামকরণ হয়। এই অনুষ্টান শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনে করা হয় বলে একে 'মড়ে মাহাঁ' বলেও চিহ্নিত করা হয়। সাঁওতাল, মুন্ডা ও ভূমিজাতদের মতো মাহালিরাও 'বাহা', 'সহরায়', 'কারাম', 'মাঘসিম' ইত্যাদি উৎসব পালন করে। বর্তমান সময়ে অবশ্য দূর্গাপূজাও আদিবাসীদের আঙিনায় সমারহে ও সমাদরে পূজিত হয়। পূজার সময় নতুন পোষাক পরিধান করার প্রচলন হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। অবশ্য মকর পরব এরা সুদীর্ঘকাল থেকে পালন করে আসছে এবং তখনও তারা নতুন বস্ত্র পরিধান করে।[৮]

মাহালিরা সূর্যদেবীর উপাসক। সিঞ বোঙ্গা বা সূর্যদেবই হলেন তাদের সূর্যদেবী। বৈশাখ মাসে তারা সূর্যদেবীর পূজা করে। এসময় তারা জাহের থানে পাঁঠা, মুরগি, পায়রা বলি দিয়ে উপাস্য দেবতা সিঞ বোঙ্গাকে তুষ্ট করে। মাহালি পুরোহিতই পূজার সমস্ত কাজকর্ম করে থাকেন। পূজার পর দেবীর কাছে বলি দেওয়া পশু-পাখির মাংস তারা রান্না করে একসঙ্গে খায়। মেয়েরা সেই মাংস খেতে পারে এবং পূজার সময় কাজকর্মে তারা অংশ নেয়। সাধারণত ১২ বছর অন্তর গ্রামের মঙ্গলের জন্য গ্রামের মাহালিরা সূর্যদেবীর পূজা করেন।

করম উৎসবের সময় আইবুড়োমেয়েরা পঞ্চমী তিথীতে দলবেঁধে পুকুরে স্নান করে। স্নান করে ফেরার সময় প্রত্যেকে ছোট ছোট বাঁশের ঝুড়িতে মাটি নিয়ে আসে আর ছোলা, মটর, কলাই মাটিতে পুঁতে রাখে। এই ঝুড়িটিকে তারা পবিত্র মনে করে। উৎসবের আগের দিন অর্থাৎ দশমীর দিন প্রতিবাড়ীতে পিঠে পায়েস হয়। সন্ধ্যার আগে গ্রামের ছেলে মেয়েরা করম গাছের ডাল আনতে জঙ্গলে যায় এবং কুড়ুলের এক কোপে করম ডাল কাটে। তারপরে সবাই গান গাইতে গাইতে ডালটিকে বয়ে এনে মাটির বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করে। পূজো শেষ হলে সকলে সারারাত নাচ গান করে। কালীপূজার সময় মাহালিদের গোরেয়া পূজা। গো-মহিষকে কেন্দ্র করে তারা এই উৎসব পালন করে। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির দিনে টুসু পরব হয়। টুসু সীমান্ত বাংলার খুব জনপ্রিয় লোক উৎসব। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ এবং বীরভূমে যে টুসু উৎসব হয় মাহালি সমাজ তাকে আস্তে আস্তে গ্রহণ করেছে। 'মাগ সিম' পূজা মাঘ মাসে হয়। এ উৎসবের মধ্যে দিয়ে পুরাতন বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে আহবান জানানো হয়। এ উৎসব না হওয়া পর্যন্ত মাহালি মেয়েরা শাল ফুল ও পলাশ ফুল পড়তে পাড়ে না। গ্রামের সবাই যাতে নিরাপদ থাকে সেই উদ্দেশ্যে এসময় ধরম ঠাকুরের পূজা হয়।[৯]

নবজাগরনের কলকাতা থেকে জঙ্গলমহল ছিল অনেক দূরে। কলকাতা থেকে দূরে প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় হয়তো সরকার জঙ্গল মহলের মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে উদাসীন ছিল। আসলে সরকার মনে করেছিল জঙ্গলমহলের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বিশেষত আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বেশি ব্যয় করলে হয়ত উপনিবেশের লাভের গুড় পিঁপড়েরা খেয়ে নেবে। তাই ব্যয়কুণ্ঠ সরকার মাহালিদের অর্থনীতি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। সমকালীন সময়েও শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উওন্নতির দিনেও এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অনেক পিছিয়ে।[১০] ঔপনিবেশিক সময়কালের সাথে বর্তমানের তাদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয়নি।

সূত্রনির্দেশ

১) *Progs : Beng : Jud (criminal) : No 16* of 13 Dec, 1805

২) Dr. Suchibrata Sen, *The Santals Of Jungle Mahals (An Agrarian History) : 1793-1861,* Calcutta, 1984, p. 3

৩) A. K. Banerjee, *W. B. D. G. : Bankura*, Calcutta, 1968, pp. 11-12

৪) H. H. Riseley, *Tribes and Caste Of Bengal, Ethnographic Glossary,* Vol.II, Calcutta, 1892, p. 40

৫) Dhirendra Nath Baske, *The Tribes of West Bengal,* Kolkata, 2002, p. 169

৬) H. H. Riseley, op. cit., p. 41

৭) Dhirendra Nath Baskey, op. cit., p. 174-176

৮) Sanjoy Mukherjee (chief ed.), Nirmalendu Mishra and Binay Barman (co. ed.), *Jungle Mahal : Continuity and Change,* Kolkata, 2013, p. 219

৯) Dhirendra Nath Baskey, op. cit., p. 178-179

১০) Sanjoy Mukherjee (chief ed.), Nirmalendu Mishra and Binay Barman (co. ed.), op. cit., p. 220